দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 JAN 2015
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৫

বইমেলা দেশে দেশে

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলেন, প্রতিবছর বইমেলার কলেবর বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। মেলা উপলক্ষে প্রচুর বই প্রকাশিত হয়। এই মেলা উপলক্ষ করেই দেশের প্রকাশনা শিল্প শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে।

■ আসিফুর রহমান সাগর

মানুষ বই কেন পড়ে? আমরা তো সারাদিনই কিছু না কিছু পড়ছি। সেল ফোনে এসএমএস, ফেসবুকের আপডেটস, খবরের কাগজ, রাস্তায় বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং। এত কিছু পড়ার পরেও বই কেন পড়তে ইচ্ছা করে? ইউরোপে পরিচালিত একটি গবেষণায় বলছে, নানা কারণে বই পড়ে মানুষ। এর মধ্যে জ্ঞান আহরণ একটি প্রধান কারণ। কিন্তু জ্ঞান অন্বেষণের আগ্রহেই মানুষ বই পড়ছে তা কেন? তাহলে তো স্কুল-কলেজে কেউ ফলাফল খারাপ করতো না। বা ক্লাসের মাঝে লুকিয়ে গল্পের বই পড়তো না। তাহলে, কেন পড়ে মানুষ বই? ওই গবেষণা প্রতিবেদনে বই পড়ার দশটি কারণ বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্মৃতিশক্তি বাড়ানো, বলবার দক্ষতা বৃদ্ধি, চিন্তার স্বচ্ছতার জন্য, বিশ্লেষণী দক্ষতা, মনোসংযোগ, লিখবার দক্ষতা, বিনোদনের জন্য, অবসাদ কাটানো ইত্যাদি। কিন্তু গুরুত্বের তালিকায় যে বিষয়টিকে তারা এক নম্বরে রেখেছে সেটি হচ্ছে—মানসিক উদ্দীপনা। বই পড়লে মানুষ মানসিকভাবে উদ্দীপ্ত হয়। সে কারণেই তারা বই পড়ে। বই মানুষের চিন্তার জগৎকে ক্রমপ্রসারিত করে। সামান্য থেকে অসামান্যে আরোহণের বড় মাধ্যম বই। সে কারণেই বইয়ের প্রতি সৃজনশীল, মননশীল তথা সাধারণ মানুষের আকর্ষণ তাই শাশ্বত-চিরন্তন।

তবে বই পড়ার অভ্যাস কী কমে আসছে মানুষের মাঝে? কয়েক বছর আগে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে এই প্রশ্ন করেছিলাম কথা

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

বইমেলা দেশে দেশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। তিনি বলেছিলেন, এই দায়িত্ব শুধু পাঠকের না, লেখকেরও। লেখককেও সমাজের, বিজ্ঞানের গতির সঙ্গে এগিয়ে চলতে হয়, না হলে পাঠকরা মুখ ফিরিয়ে নেবেই। তিনি বলেছিলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের মাঝে দ্রুত প্রভাব ফেলে। মানুষও প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যায়। পারস্পরিক এই প্রভাবটা ভাষার ওপর এসেও পড়ে। একজন লেখক যত দ্রুত এই পরিবর্তনকে উপলব্ধি করতে পারবে, পরিবর্তনকে বুঝে নিয়ে লিখতে পারবে ততই সে সক্রিয় থাকবে। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটছে। সেই পরিবর্তনের ঘূর্ণিপাকে পড়েছে বলেই, আপাত মনে হচ্ছে বই মানুষ কম পড়ছে।

তবে, বাংলাদেশের বইমেলা দেখে কেউ বলবে না বই পড়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। বরং যারা বিশ বছর আগের বইমেলাকে দেখেছেন তারা এখনকার বইমেলাকে দেখলে বলতে বাধ্য হবেন বইমেলা, বইয়ের প্রকাশনা, লেখক ও পাঠক বাড়ছে। মানুষের বইয়ের প্রতি ভালোবাসা কমেনি। আর এই অবস্থা সৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলার অবদান সবচেয়ে বেশি।

বই এলো কেমন করে

সম্রাট অশোকের জন্মেরও চার হাজার বছর আগে এসিরিয়া ও ব্যাবিলন নামে দুটি দেশে পাথরের উপর লেখার প্রচলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাদের দেশে পাথর সহজলভ্য ছিল না। তাই তারা একসময় কাদা মাটির উপর লিখে তা পুড়িয়ে সংরক্ষণ করতো। ব্যাবিলনের একটি লাইব্রেরিতে এ রকম ২২ হাজারেরও বেশি পাথুরে বই পাওয়া গেছে। এরপরও নীল নদের তীরে পিরামিডের দেশ মিশরে প্যাপিরাস নামে গাছের পাতায় লেখা শুরু করলো। প্যাপিরাসের বইগুলো লম্বা কাপড়ের থানের মত হত। এই বইগুলো গুটিয়ে রাখা হত। সবচেয়ে বড় বইটির দৈর্ঘ্য ছিল ১২০ ফুট অর্থাৎ ৮০ হাত লম্বা। তাদের লেখার পদ্ধতিটাও ছিল অদ্ভুত। আজকের দিনে আমরা বাম বা ডান যেদিক থেকেই লেখা শুরু করি না কেন লাইন শেষে আবারও ফিরে আসি সেদিকে। কিন্তু মিশরীয়রা ডানদিক থেকে লেখা শুরু করে লাইন শেষ হলে পরের লাইন শুরু করতো বামদিক থেকে। আবার এই লাইন শেষ হলেই তারপরের লাইন শুরু করতো ডানদিক থেকে। অনেকটা কৃষকদের জমিতে হাল চাষ দেয়ার মত করে। একসময় এই প্যাপিরাস শুধু মিশরে নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। এই প্যাপিরাস থেকেই ইংরেজি 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি। মিশরীয়রা প্যাপিরাস ব্যবহার করলেও চীনারা লিখত বাঁশের ফলকে। এমনকি তারা কাপড়েও লিখত। কাগজ প্রথম তৈরি করে

চীনারা। বই ছাপাবার কায়দাও চীনারাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল। পরে সে কৌশল ইউরোপ গ্রহণ করে। ১৫ শতকে জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গ উদ্ভাবন করলেন আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র। ১৪৫৬ সালের দিকে তিনি প্রথম বাইবেল গ্রন্থকে তার প্রেসে ছেপে প্রকাশ করেন। এই বইটি এখন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে সংরক্ষিত আছে। দর্শনার্থীরা তা দেখতে পারেন। গুটেনবার্গের বাইবেল ছাপানোর এই প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়লো ইউরোপসহ সারাবিশ্বে। এরপর বইয়ের ইতিহাস নিল নতুন মোড়। যা আজকের চরম উৎকর্ষের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে।

আমাদের বইমেলা, বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলা

বাংলাদেশে বইমেলার উদ্ভবের ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। বইমেলার চিন্তাটি এ দেশে প্রথম ভাবেন প্রয়াত কথাসাহিত্যিক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক সরদার জয়েনউদদীন। তিনি বাংলা একাডেমিতেও একসময় চাকরি করেছেন। বাংলা একাডেমি থেকে ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক পদে নিয়োগ পান। এ সময় শিশু গ্রন্থমেলার আয়োজন করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি) নিচতলায়। সম্ভবত, এটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। এরপরে ১৯৭০ সালে নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জে একটি গ্রন্থমেলার আয়োজন করেন তিনি। এই মেলায় সরদার জয়েনউদদীন একটি মজার কাণ্ড করেছিলেন। মেলার ভেতরে একটি গরু বেঁধে তার গায়ে লিখে রাখা হয়েছিল 'আমি বই পড়ি না'। মানুষকে গ্রন্থপাঠে আগ্রহী করে তুলতেই সরদার জয়েনউদদীনের এই অভিনব প্রয়াস ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এরপর তিনি যখন গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক, তখন ইউনেসকো ওই বছরকে অর্থাৎ ১৯৭২ সালকে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। গ্রন্থমেলায় আগ্রহী সরদার সাহেব এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে ১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলার আয়োজন করেন। সেই থেকেই বাংলা একাডেমিতে বইমেলার সূচনা।

এদিকে, ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এই ৩২টি বই ছিলো চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই। বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সাথে সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ সালে মেলার সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। এই সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা।

১৯৮৩ সালে কাজী মনজুরে মওলা যখন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, তখন তিনি বাংলা একাডেমির আয়োজনে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজন সম্পন্ন করেন। কিন্তু স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষা ভবনের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে ট্রাক তুলে দিলে দুইজন ছা নিহত হয়। ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর সেই বছর আর বইমে করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সালে সাড়ম্বরে বর্তমানের অমর একুশে গ্রন্থমেলার সূচনা হয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ বাংলা ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গের যে ঘটনা ঘটে, সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই এই মাসে আয়োজিত বইমেলার নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমে

বইমেলা প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলেন, প্রতিবছর বইমেলার কলেবর বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। মেলা উপলক্ষে বিপুল বই প্রকাশিত হয়। বলা চলে এই মেলা উপলক্ষ করেই বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে। এখন অনেক নতুন প্রকাশক এই শিল্পে এসেছেন। পাঠকেরা সংখ্যাও প্রতিবছর বাড়ছে। এই মেলা এক মাস ধরে চলে। পৃথিবীতে আর কোন বইমেলাই এত দিন ধরে চলে না। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দিন ধরে চলা বইমেলা। বইমেলার পরিসর বাড়িয়ে এর একটি বড় অংশকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর ফলে অমর একুশের স্মৃতিবাহী এই মেলাটির ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটল। যে মেলা একুশের মহান ঐতিহ্যকে ধারণ করে এত বিশাল আকার ধারণ করেছে, তা এখন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্থান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই স্থান থেকেই ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাঙালির মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। এখানেই রয়েছে স্বাধীনতাস্তম্ভ এবং শিখা চিরন্তন। আরও আছে মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল ও স্বাধীনতা-জাদুঘর। তাই এখানে বইমেলা সম্প্রসারিত হওয়ায় বাংলাদেশের বাঙালির জাতিসত্তার উদ্বোধনের স্মৃতিবাহী একুশের ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা যুক্ত হয়ে মেলাটি এখন নতুন আঙ্গিক, পরিসর ও মাত্রিকতায় স্থিত হয়েছে।

দেশে দেশে বইমেলা

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা পৃথিবীর প্রাচীন বইমেলা। এ মেলার সূচনা হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে। প্রতি বছর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মূলত: এ মেলা বই ব্যবসায়ী ও প্রকাশকদের জন্য। সে জন্য পাঁচদিনব্যাপী এ মেলার প্রথম তিন দিন শুধু প্রকাশক, লেখক ও বিপণন প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত থাকে। পরবর্তী দুটি দিন থাকে সাধারণ মানুষদের জন্য। প্রকাশক এবং পুস্তক বিপণনকারীদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরিই এ আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারক জোহানেস গুটেনবার্গ তার আবিষ্কৃত ছাপাখানাটি বইয়ের জগতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করে। তিনি ছাপাখানার যন্ত্রাংশ এবং ছাপানো বই বিক্রির জন্য ফ্রাঙ্কফুর্টে আসেন। গুটেনবার্গের দেখাদেখি ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের স্থানীয় বই বিক্রেতারাও তাদের প্রকাশিত বই নিয়ে বসতে শুরু করেন। এগুলো কিনতে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজনও আসতে শুরু করেন। সেই আসা-যাওয়া থেকেই জমে উঠতে থাকে ফ্রাঙ্কফুর্টের বইমেলা। জার্মান ভাষায় ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলাকে বলা হয়- ফ্রাঙ্কফুর্টার বুচমেস। ১৭ শতক পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফুর্টের বইমেলাই ছিল ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইমেলা। পরে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে এ মেলা। এর মাঝে শেষ হয় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ফ্রাঙ্কফুর্টের বইমেলা তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে শুরু করে।

গুয়াডালাজারা আন্তর্জাতিক বইমেলা, স্পেন: স্পেনের গুয়াডালাজারা বইমেলাকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলা হিসাবে দাবি করা হয়। স্পেনিশ ভাষায় এ মেলাকে বলা হয় 'ফেরিয়া ইন্টারন্যাশনাল ডেল লিবরো দে গুয়াডালাজারা'। এই মেলাটিও প্রকাশক, লেখক ও পরিবেশকদের প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়া লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের দেখা করবার জন্যেও এই মেলা খুব উপযুক্ত একটি ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রতি বছরের নভেম্বরে নয়দিন ধরে চলে এ বইমেলা। যা ১৯৮৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে।

কলকাতা বইমেলা, পশ্চিমবাংলা, ভারত : কলকাতা বইমেলাকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বইমেলা হিসাবে দাবি করা হয়। এ মেলা শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, আফ্রিকান ইউনিয়ন, সুইডেন, রোমানিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা উল্লেখযোগ্য। প্রতি বছর একটি দেশের শিল্প-সাহিত্যকে থিম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

কায়রো আন্তর্জাতিক বইমেলা: আরব বিশ্বের প্রাচীন বই মেলা এটি। মিসরীয় বুক অর্গনাইজেশন এ মেলার আয়োজক। এটি শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। শিশু সাহিত্যে আগ্রহী লেখক ও প্রকাশক তৈরি এ মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রান্না বিষয়ক বইমেলা, প্যারিস: রান্না বিষয়ক বইয়ের এই মেলাটিও বেশ জনপ্রিয়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, চিলি, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও চীনসহ বিভিন্ন দেশ এ মেলায় অংশ নিয়ে থাকে।